কবি স্মৃতি

প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ

অনেকদিন পরে কাল (৮ই মার্চ, ১৯৪২) শান্তিনিকেতনে এলুম—কবি যাওয়ার পরে এই প্রথম। কাল সকালে ট্রেনে আসতে আসতে মনে পড়ছিল ১৯১০ সালে, বত্রিশ বছর আগে এই রকম একটা সকাল বেলার গাড়িতেই প্রথম শান্তিনিকেতনে আসি। মাঝে এই বত্রিশ বছর। আর মনে পড়ছে ঠিক এক বছর আগে মার্চ মাসের মাঝামাঝি দিল্লী থেকে ফিরতিপথে শান্তিনিকেতনে এসেছিলুম। সন্ধ্যেবেলায় এখানে পৌঁছেই কবির সঙ্গে দেখা হল। বত্রিশ বছর আগেও শান্তিনিকেতনে পৌঁছেই প্রথমে দেখা করতে গিয়েছিলুম কবির সঙ্গে। কাল থেকে বারেবারেই মনে পড়ছে যে, এবার আর দেখা করা হবে না। এক-একটা ঘরে যাই যেন মনে থাকে না কবি নেই। হয়তো এখনি দেখতে পাবো পাশে কোথাও রয়েছেন। তারপরে বুকে মোচড় দিয়ে ওঠে। কাল রাত্রে শুতে গেলুম—সেই পুরানো ঘর, আসবাব, টেবিল, চেয়ার—সবকিছুই রয়েছে, অথচ কবির সঙ্গে দেখা হয়নি। রাত্রে বারোটা বেজে গেল, একটা বাজলো। আজ সকালে উঠে কোনো তাড়া নেই। আগে কোন্ ভোরে রানী উঠে তৈরি হয়ে নেয়—কবি নইলে অপেক্ষা করে থাকবেন। সকালে গিয়ে চায়ের টেবিলে বসলুম—তারপরেই ওঁর সঙ্গে দেখা করতে যাই' বড়ো ঘরটার পাশ দিয়ে চলে গেলুম। ঘর খালি। দক্ষিণের ঘরটায় এখন Museum করা হয়েছে—একবার উঁকি মেরে চলে এলুম। উপরে এসে বাগানের দিকে তাকিয়ে দেখি, ফাল্গুন মাসে বৌঠানের বাগান ফুলে ফুলে উজ্জ্বল। পরশু কালবৈশাখী ঝড়ের পরে সকাল বেলার বাতাস স্নিগ্ধ। কবি এক সময়ে যে ঘরে থাকতেন, তার জানলা দিয়ে দূরে কোপাই নদীর পারে বন সবুজ রঙ লেগেছে। কবির পুরানো বাড়ি, উদীচি, শ্যামলী, পুনশ্চর সামনে কবির হাতে-লাগানো গাছের পাতা আলোয় বাতাসে ঝলমল করছে। চুপ করে বসে আছি। কতো পুরানো গানের সুর যেন ভেসে বেড়াচ্ছে।

বত্রিশ বছর আগের সেই দিনগুলি আবার নতুন করে দেখা দিয়েছে। ছেলেবেলায় ওঁকে দেখেছি দূরে থেকে। ঠাকুরদাদার সঙ্গে জোড়াসাঁকোর বাড়িতে যেতুম মহর্ষিকে দেখতে—ঠাকুরদাদা ছিলেন মহর্ষির পুরানো শিষ্য—ঠাকুরদাদার দীক্ষা হয় মহর্ষির কাছে। তখন মহর্ষিই ছিলেন আমার কাছে বেশি উজ্জ্বল। এদিকে সঙ্গে সঙ্গে কবির লেখাও পড়তে আরম্ভ করেছি। বড়ো একখণ্ড গ্রন্থাবলী তখন বেরিয়েছে—যেটাকে আমরা "টালি" সংস্করণ বলি—একটা টালির মতো দেখতে বলে। মা ছিলেন কবির মহাভক্ত—সমস্ত বই তাঁর কাছে ছিল, আর সারাদিন ঘর-কন্নার ফাঁকে ফাঁকে কবির বইগুলি নিয়ে নিয়ে নাড়াচাড়া করতেন। কখনো কখনো আমাকে কবিতা পড়ে শোনাতেন। অক্ষর-পরিচয় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কবির লেখার সঙ্গেও আমার পরিচয় শুরু হয়। মনে পড়ছে যে, ঐ-কার জিনিসটাকে যখনো ভালো করে আয়ত্ত করতে পারিনি, সেই বয়সেই "রাজা ও রানী" পড়তে আরম্ভ করেছি। নাটকের মধ্যে "জনৈক" পথিক বা আর কারুর প্রবেশ; আমি চেঁচিয়ে পড়ছি "জনোক"। মা শুনতে পেয়ে ঐ-কার আর ঔ-কারের তফাৎ বুঝিয়ে দিচ্ছেন। এই রকম করে কবির লেখার ভিতর দিয়েই বাংলা শিখেছি। ছেলেবেলায় ওঁর রঘুপতির* অভিনয় আমাদের পাশের বাড়িতে তখন "সঙ্গীত-সমাজ" ছিল, সেখানে দেখেছি। আরো একটু পরে স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে তাঁর বক্তৃতা শুনেছি। উনিও আমাকে দেখেছেন, প্রণাম করেছি, কিন্তু সে হল পারিবারিক পরিচয়। ঠাকুরদাদার আমল থেকে মহর্ষি আর জোড়াসাঁকোর বাড়ির সঙ্গে আমাদের পরিবারের ঘনিষ্ঠ যোগ। ওঁদের বাড়ির ছেলেমেয়েদের অনেকের সঙ্গে জ্যেঠামশায়, বাবা, মা এঁদের জানা-শোনা বন্ধুত্ব। আর আমার সবচেয়ে গভীর টান মহর্ষির সম্বন্ধে। আমি যে সময়ের কথা বলছি, মহর্ষির বয়স তখন তিরাশি-

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

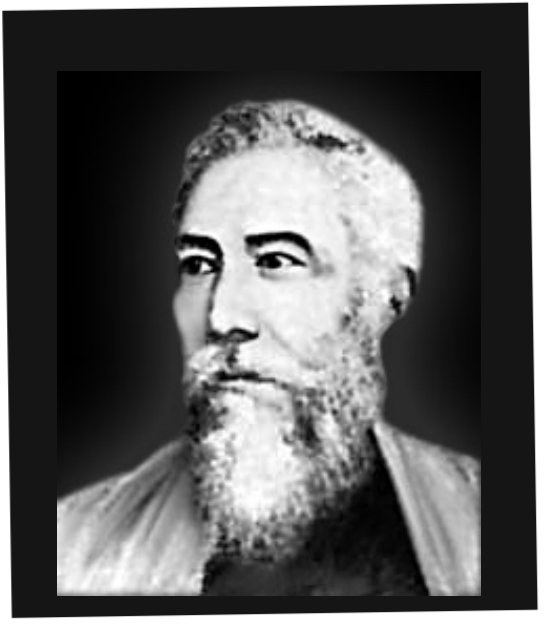

চুরাশি হবে—চোখে প্রায় দেখতে পান না, কানেও কম শুনতেন। জোড়াসাঁকোর বাড়ির তিনতলায় দক্ষিণ দিকের ঘরে থাকেন—পরে কবিও এই ঘরেই থাকতেন। লোকজন তখন বেশি যাওয়া বারণ। ঠাকুরবাবার মতো পুরনো দিনেরা আর আত্মীয়স্বজন কেউ কেউ তখন দেখা করতে পেতেন। লালবাড়ির ভিতর দিয়ে সিঁড়ি তখনো তৈরি হয়নি। বড়ো বাড়ির ভিতরের ঘোরানো গোল সিঁড়ি দিয়ে উঠে, দক্ষিণ দিকের ছাদ পেরিয়ে মহর্ষির ঘরে যেতে হত। উনি বসে থাকতেন একটা উঁচু হাতওয়ালা মাথা পর্যন্ত ঠেস-দেওয়া যায়, এমন একটা বড়ো চেয়ারে। গায়ে জোব্বা, পায়ে সাদা মোজা। আমি গিয়ে পায়ের কাছে বসতুম, আর পায়ে হাত বুলিয়ে দিতুম। বুড়ো আঙুলটা খুব বড়ো আর বয়সের সঙ্গে একটু বেঁকে গিয়েছে। মহর্ষি অনেক সময় তাঁর হাতটা আমার মাথার উপরে রাখতেন—মহলানবিশের ছোট নাতিটির পরিচয় তাঁর জানা ছিল। মাঝে মাঝে আমার খবর নিতেন। ঠাকুরবাবাকে একবার বলেন যে ওকে ব্রাহ্মধর্মের শ্লোক মুখস্থ করাও। মহর্ষির নিজের সভাপণ্ডিত শিবধন বিদ্যার্ণব মহাশয়ের কাছে ব্রাহ্মধর্ম পড়বার ব্যবস্থা করে দেন। বিদ্যার্ণব মহাশয়কে মহর্ষি কাশীতে পাঠিয়ে সংস্কৃত শিখিয়েছিলেন—তাঁর উচ্চারণ বিশুদ্ধ—বাংলা দেশের মতো বিকৃত নয়। ব, জ, য, ণ, ষ, স—উচ্চারণে ব এ সমস্ত আলাদা আলাদা উচ্চারণ। বিদ্যার্ণব মশায়ের কাছে সেই ছেলেবেলায় সংস্কৃত পড়ায় আমারও উচ্চারণ অনেকটা বিশুদ্ধ—বাংলা উচ্চারণ করলে লাগে। যাহোক—মহর্ষি একদিন বললেন যে, তাঁকে শ্লোক আবৃত্তি করে শোনাতে হবে। ভয়ে ভয়ে আবৃত্তি করলুম। মহর্ষি খুশী হলেন দেখে যে কী আনন্দ, মন উৎফুল্ল হয়ে উঠল। এই রকম করে ছেলেবেলায় মহর্ষির কাছে গিয়েছি। আরেক দিনের কথা মনে পড়ে। মহর্ষির পায়ের কাছে বসে আছি। সেদিন ঠাকুরবাবা একা নয়, শিবনাথ শাস্ত্রী আর উমেশচন্দ্র দত্তও ছিলেন। ওঁদের অনেক বড়ো বড়ো কথা, আমি কিছু বুঝি না—আমি শুধু মহর্ষির মুখের দিকে তাকিয়ে আছি আর পায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছি। উনি বোধহয় একবার পায়ে হাতের ছোঁয়া পেয়ে বুঝতে পারলেন, আমি পাশে রয়েছি—আমার মাথায় হাত রেখে বললেন তুমি খুব ভালো হবে তুমি খুব ভালো হবে। তাঁর এই কথা আর ব্রাহ্মধর্মের শ্লোকগুলি তিনি আমাকে আশীর্বাদ দিয়ে গিয়েছেন।

ষাটেক বছর আগের দিনগুলি মনে পড়ছে। অতো বড়ো একটা মানুষকে দেখেছি কতো কাছ থেকে। আর ছোটখাটো কতো টুকরো দিনের কথা মনে পড়ছে। বড়ো বড়ো কতো কাণ্ড ঘটেছে, কতো কবিতা, গান, অভিনয়। আজ মনে পড়ছে, এ সমস্ত ছাপিয়ে ওঁর কাছে কতো স্নেহ পেয়েছি।

১৯১১ সালের গ্রীষ্মের ছুটির আগে দু মাস শান্তিনিকেতনে কাটিয়েছিলুম—তখন কলেজে পড়ি, সতেরো আঠারো বছর বয়স। তখন সারাদিন প্রায় ওঁর কাছে কাছেই থাকতুম। শান্তিনিকেতনের পুরোনো Guest House-এর দোতলায় পূর্বদিকের সেই ছোটো ঘরখানায় উনি থাকেন। এই ঘরে বসেই গীতাঞ্জলি, রাজা, ডাকঘর লিখেছেন। মাঝে একটা বসবার ঘর। আমি থাকি পশ্চিমের ঘরে। গ্রীষ্মকাল—আমি একটা মাদুর নিয়ে উপরের বড়ো ছাদে শুতাম।

কবির চাকর ছিল উমাচরণ—সেই আমাকে খাওয়াতো। সন্ধ্যেবেলা আশ্রমের লোকজন দেখা করে যাওয়ার পরে দক্ষিণে গাড়ি-বারান্দার ছাদটায় কবি বসে থাকতেন একটা লম্বা চেয়ারে। সন্ধ্যের আগেই আমাদের খাওয়া হয়ে যেত। খুব সাদাসিধা, হয়তো একটা ফল বা মিষ্টি আর এক গেলাস ঘোলের সরবৎ। রাত্রে, সে সময় রান্না হতো না। সকাল বেলা চায়ের সময় পাঁউরুটি আর ফল। দুপুরে একটু ভাত আর দু-একটা নিরামিষ তরকারি—তখন আর্থিক অনটন চলছে। আর কেউ নেই। রথীবাবু, বৌঠান, মীরা সকলে শিলাইদহে। উমাচরণই সব ব্যবস্থা করত। ঐ একাধারে চাকর, রাঁধিয়ে, সব কিছু।

সমস্ত কিছু ছিল সাদাসিধা। ছোটো ঘরখানায় খুব নীচু করে পাতা ওঁর বিছানা। এক কোণে একটা ছোটো নীচু লেখবার ডেস্ক। এছাড়া তাঁর আসবাবপত্র কিছু নেই। কয়েকখানা বই ডেস্কের একপাশে আর লেখবার সরঞ্জাম। ঘরে একসঙ্গে দু-তিন-জনের বেশি মাটিতে বসবার জায়গা নেই। পাশেই ছোটো স্নানের ঘর। কাপড়-চোপড়, পাজামা, পাঞ্জাবি আর একটা জোব্বা সেই ঘরেই আলনায় টাঙানো। সিঁড়ির পাশে একটা বাক্সে বোধহয় আর কিছু কাপড় থাকতো। বারান্দায় একটা গোল টেবিলে বসে খাওয়া। এই ছিল তখনকার ব্যবস্থা।

রাত্রে খানিকক্ষণ কথাবার্তা বলতে বলতে দেখতুম, উনি চুপ করে আছেন। আমি ছাদে চলে যেতুম। কোনো কোনো দিন আমিও অনেকবার ছাদে বেড়াতে বেড়াতে দেখতুম, কবি তখনো স্তব্ধ হয়ে বসে আছেন। তারপরে গভীর রাতে কখন শুতে যেতাম। সূর্য ওঠবার আগে নীচে এসে দেখতুম যে কবি তার অনেক আগে উঠেছেন, কোনদিন বারান্দায় বসে আছেন। কোনোদিন বা মন্দিরের সামনে পুব দিকের চাতালে গিয়ে বসেছেন। সকালবেলা চায়ের টেবিলে নানা রকম আলোচনা। কখনো কখনো বিদ্যালয় থেকে কেউ আসতেন কাজ-কর্মের কথা নিয়ে। কখনো অজিত চক্রবর্তী আসতেন কিছু আলোচনা করবার জন্য। সকালে অনেকক্ষণ কবি নিজের লেখাও লিখতেন, চিঠির জবাব দিতেন। বেশ একটু বেলায় যেতেন স্নানের ঘরে। এই ছিল ওঁর অবসর। কখনো একঘণ্টা, কখনো দেড়-ঘণ্টাও স্নানের ঘরে থেকেছেন। কখনো দুপুরেই গান করছেন। দুপুরে খাওয়ার পরে আবার কাজ। বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা। লেখা। অধ্যাপকদের সঙ্গে আলোচনা। এছাড়া মাঝে মাঝে সকালে বা দুপুরে ক্লাস পড়াতেন। কোনো নতুন গান লেখা হলেই অজিত বা দিনুবাবুকে ডেকে পাঠাতেন। বিকালে এক একদিন গান শেখানোর পালা। সন্ধ্যে বেলা আবার দু-চার জনের সঙ্গে কথাবার্তা। মাঝে মাঝে খানিকটা বেড়িয়ে আসতেন। কখনো বা বিদ্যালয়ে যেতেন। দু-একদিন নীচু বাংলা থেকে বড়োবাবু (কবির বড়োদাদা) এসে হাজির। খানিকটা দর্শন, বা সাহিত্য নিয়ে আলোচনা। এই রকম করে দিনের পরে দিন ওঁকে দেখেছি—ওঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় এই রকম করে ঘটেছে। শেষের দিকে নিজের কাজ, নানা লোক নানা ব্যবস্থা নিয়ে ওঁর কাছ থেকে খানিকটা দূরে সরে গিয়েছিলুম। কিন্তু আগে শান্তিনিকেতনে এসে ওঁর

সুকান্ত ভট্টাচার্য
ছাড়পত্র ২·০০ ॥ ঘুম নেই ২·০০
পূর্বাভাস ১·৭৫ ॥ মিঠেকড়া ২·০০
অভিযান ১·৭৫ ॥ হরতাল (যন্ত্রস্থ)
দেবব্রত মুখোপাধ্যায়
ধারা থেকে মাণ্ডু ২·৫০
কএকটি চিত্র ১·০০
অশোক ভট্টাচার্য
কবি সুকান্ত ২·৫০
স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য
ছোট বড় মাঝারি ২·০০
সারস্বত লাইব্রেরী,
২০৬, কর্নওয়ালিস স্ট্রীট : কলি-৬

স্বনামধন্য নাট্যকার
মোহন সিংহদারের সামাজিক নাটক
অন্তরীণ
শীঘ্রই প্রকাশিত হচ্ছে
পরিবেশক :
অমর লাইব্রেরী,
৩৪।১, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা—১২
(সি ৩৮৫১)

কাছেই থাকতুম। বেশির ভাগ সময় কাটতো ও'র কাছে।

বাঙালীর একটা স্বভাব আছে মাখামাখি করা। কবির ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। ও'র নিজের সব ব্যবস্থায় চিরদিন একটা দূরত্ব ছিল। তাই এক একদিন যখন তার ব্যতিক্রম ঘটত, তখন ও'র ভালোবাসার নতুন পরিচয় পেতুম। স্নানের ঘর উনি বরাবর আলাদা ব্যবহার করতে ভালোবাসতেন। তাই ও'র স্নানের ঘর অন্য কেউ ব্যবহার করত না। কিন্তু একদিন মনে আছে গ্রীষ্মকালে দুপুরের গাড়িতে এসে পৌঁছেছি, তখন বেলা সাড়ে বারোটা একটা হবে। জানতেন আমি আসবো। না খেয়ে অপেক্ষা করেছেন। আমি যেতেই বললেন, যাও তোমার জন্য জল রেখে দিয়েছি, স্নান করে এসো। তখন থাকতেন "দেহলি"র দোতলায়। সেখানে শুধু একটা ঘর। আমি থাকবো Guest House-এ— আরো খানিকটা হেঁটে যেতে হবে। বুঝলুম যে তা ইচ্ছা নয়। অন্য সময় হলে হয়তো না বলতুম। তাড়াতাড়ি স্নানের ঘরে গিয়ে দেখি একটা পরিষ্কার তোয়ালে, জল সব ঠিক করিয়ে রেখেছেন। এই রকম ছোটো ছোটো কতো কথা মনে পড়ছে।

সেও এক গ্রীষ্মের দিনের কথা। পঁচিশে বৈশাখের কাছাকাছি। সারা দিন অসম্ভব গুমোট গরমের পরে প্রকাণ্ড একটা কাল বৈশাখীর ঝড় বৃষ্টিতে ধুইয়ে দিল। তখন ঝড়ের সময় মাঠে ঘুরে বেড়ানো ছিল একটা মস্ত বড়ো আনন্দ। শিলাবৃষ্টির মধ্যে সন্ধ্যে বেলায় খুব দৌড়াদৌড়ি করে কাপড় ছেড়ে ও'র কাছে গিয়ে বসেছি। হঠাৎ খুব ঠাণ্ডা পড়েছে। একটু পরেই উনি উঠে পাশের ঘরে গেলেন। একটা গরম কাপড় কোথা থেকে বের করে এনে গায়ে জড়িয়ে দিয়ে বললেন, বেশ ঠাণ্ডা আছে। আর বাহাদুরি করতে হবে না। অনেকদিন পর্যন্ত—আমার বিয়ে হবার আগে—ও'র কিরকম একটা ধারণা ছিল যে আমার খাওয়া দাওয়া বা শোয়া সম্বন্ধে কিছু খেয়াল থাকে না। তাই সর্বদা ও'র সঙ্গেই আমার খাওয়ার ব্যবস্থা করতেন। আর শুতামও প্রায়ই ও'র পাশে বা কাছাকাছি কোনো ঘরে। ও'র বরাবর ছোটো ছোটো ঘরে থাকা অভ্যাস, নতুন নতুন বাড়ি যখন করতেন তখন গোড়ায় একখানা বই দুখানা শোবার ঘর থাকত না। তাই ও'র বসবার ঘর খাটিয়া ফেলে যে কতোদিন শুয়েছি তার ঠিক নেই। এক দিনের কথা মনে আছে। বোধহয় ১৯২২ সাল, ৭ই পৌষের উৎসবের আগের দিন বিকালের গাড়িতে এসে পৌঁছেছি। উনি তখন থাকেন "প্রান্তিক" বলে যে বাড়িটার নাম, তাতে। একখানা ছোটো শোবার ঘর, আর প্রায় সেই রকমই ছোটো একটা বসবার ঘর, এক কোণে সেই মাপের একটি স্নানের ঘর, আর চার দিকে শুধু বারান্দা। শোবার ঘরে একটা ছোটো খাটিয়া ফেলা ছিল। ঘরটা এতো ছোটো যে সেখান থেকে ওঁর তক্তপোশ তিন চার হাত দূরে। মাঝের দরজায় পর্দা ফেলা। তার ঠিক আগে আলিপুরে হাওয়া আপিসে প্রথম গিয়েছি—উনি কয়েকদিন সেখানে আমার কাছে ছিলেন—তখনো আমার বিয়ে হয়নি। জানতুম মীরার জন্য ও'র মন খুব ব্যথিত আছে। রাত্রে খানিকক্ষণ কথাবার্তা বলবার পরে গিয়ে বারান্দায় বসলেন। আমি শুয়ে পড়লুম। তখন বেশ গভীর রাত। খানিকক্ষণ ঘুমবার পরে হঠাৎ শুনি উনি শোবার ঘরে, বোধহয় বিছানায় শুয়ে শুয়ে গান আরম্ভ করেছেন।

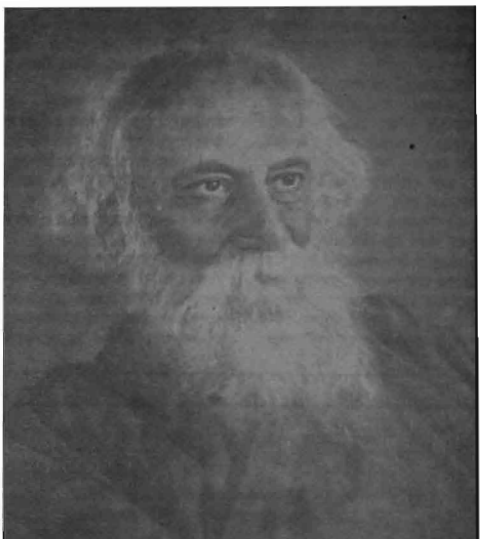

"অন্ধজনে দেহ আলো
মৃত-জনে দেহ প্রাণ।
তুমি করুণামৃত-সিন্ধু
করো করুণা-কণা দান॥
শুষ্কহৃদয় মম
কঠিন পাষাণ সম,
প্রেম-সলিল ধারে সিঞ্চহ শুষ্ক নয়ান।"

তখন বোধহয় রাত তিনটা হবে। দুঘণ্টা ধরে বারবার করে গাইতে লাগলেন। আস্তে আস্তে, যাতে আমি জেগে না যাই। ভোর-বেলা পর্যন্ত শুয়ে শুয়ে শুনলুম। বুঝলুম যে গানের ভিতর দিয়ে মনকে শান্ত করছেন। এক একটা কথা কতো-বার করে ফিরে ফিরে আওড়াতে লাগলেন। বাইরে থেকে বোঝা যায় না যে, কতোখানি ভিতরের তাগিদে উনি গান লিখেছেন। শুধু কেন, ও'কে কাছে থেকে না দেখলে সাহিত্য, ও'র কবিতা, ও'র লেখা যে কতো খানি সত্য ছিল ও'র কাছে, তা কেউ বুঝতে পারবে না। ফাল্গুন চৈত্র মাসে বাইরের আকাশের দিকে তাকিয়ে যখন গান গাইতেন, তখন ও'র সমস্ত শরীর মন যেন সাড়া দিয়ে উঠত। কাল বৈশাখীর ঝড়, বর্ষার দিনেও আবার দেখেছি ও'র মন কেমন মেতে উঠেছে। যারা শুধু ও'র লেখা পড়বে, তারা কিছুতেই বুঝতে পারবে না যে কতোখানি বাদ পড়ল। এবার শান্তি-নিকেতনে এসে থেকে থেকে খালি মনে হচ্ছে যে সমস্ত যেন ঝিমিয়ে গিয়েছে। কিন্তু ধরে তো রাখা যায় না। আমরাও তো চলেছি। আমাদের দিনগুলিও একে একে'কে নিবে আসছে। কালকের যে দিন

রবীন্দ্রনাথ ফটো: শম্ভু সাহা

সেটা ফুরিয়েছে বলেই তো আজকের দিনটিকে পেয়েছি। আবার আজকের দিনকে না ফুরিয়ে দিলে কাল আবার নতুন দিন আসবে কি করে?

এ সবই জানি, কিন্তু তবুও মনের মধ্যে ফাঁক থেকে যায়। শুধু কবি সম্বন্ধে নয়। সব জানাশুনো, পরিচয় ছেড়ে ছেড়ে নতুন হয়ে পড়েছে। যেখানেই সৃষ্টি সেইখানেই তাই এত বাধা। কিন্তু মানুষ তবু ধরে রাখতে চায়। আঁকড়িয়ে রাখতে চায়। কিন্তু সে হল মোহ, নিতান্তই মিথ্যা। মহর্ষি শান্তিনিকেতনে আশ্রম প্রতিষ্ঠার পরে বলে দিয়েছিলেন যে ওঁর কোনো ছবি কোনো প্রতিমূর্তি যেন ওখানে না রাখা হয়। ওঁর মনে ভয় ছিল যে, এই মিথ্যাটাকে মালা চন্দন, ধূপধুনো দিয়ে পুজো করে আশ্রমের আসল সত্য রূপটি চাপা পড়বে। কবি অনেক বার আমাকে এই কথা বলেছিলেন।

"সদর স্ট্রীটে থাকতে বাবামশায় আমাকে ডেকে বললেন, রবি, তোমাকে আমি এই কথাটা বলে রাখছি—এ দায়িত্ব তোমার। শান্তিনিকেতনে আশ্রমে আমার কোন প্রতিকৃতি যেন না থাকে।"

তাই এখানে আজ পর্যন্ত আশ্রম-প্রতিষ্ঠাতার কোন ছবি কোথাও নেই। কবির নিজের মনের ধারাও ছিল ঠিক তাঁর পিতার মতো। আমাকে একদিন বলেছিলেন—

"রামমোহন রায় যে ব্রিস্টলে মারা যান, খুব ভালো হয়েছিল। এ দেশ এমন দুর্ভাগা—এখানে মরলে হয়তো ওঁকে পুজো করবার একটা জায়গা তৈরী হত।"

আজ রথীবাবুর সঙ্গে এই নিয়ে কথা হচ্ছিল। গোড়ার দিকে "শ্যামলী" বাড়িতায় কবির খাট, বিছানা, চেয়ার, টেবিল, কাপড়—চোপড় সব উনি যেমন ব্যবহার করতেন, সেই রকম করে সাজিয়ে রাখা হয়েছিল। লোকে দেখতে আসত। ফুল দিয়ে যেত। তারপরে ধূপধুনোও দেওয়া হয়। রথীবাবু সম্প্রতি জিনিসপত্র সরিয়ে অন্য লোকের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। আমি অবশ্য তাতে সায় দিলাম। রথীবাবু বললেন, "অথচ বাইরে থেকে যখন লোকজন আসে একটা কিছু ব্যবস্থা থাকলে ভালো হয়। ভাবছি যে, যে ঘরটা উনি সব শেষে ব্যবহার করেছিলেন সেটা খালি করে, খুব পরিষ্কার করে রেখে দেব। সেখানে ওঁর ব্যবহার করা কোনো আসবাব থাকবে না। কিন্তু ওঁর আঁকা এক একখানা ছবি, ওঁর কোনো বই বদলিয়ে বদলিয়ে রাখা হবে।" আমি বললুম যে, তা হতে পারে, কিন্তু এর চেয়েও আরো ভালো হয় অন্য একটা ব্যবস্থা। শান্তিনিকেতন আশ্রমে বারবার করে কবি বলেছেন এখানকার এই উন্মুক্ত উদার প্রান্তরের কথা—দূরে যেখানে আকাশ আর মাটিতে মিশে গিয়েছে সেইখানে পূর্বদিকে সূর্য ওঠা আর পশ্চিমে আবার সেইরকম করেই ডুবে যাওয়া। এখানকার এই খোলা মাঠের মধ্যে একটা জায়গা একটু উঁচু করে আশেপাশে ফুলের গাছ দিয়ে সাজিয়ে দিন। তার উপরে হয়তো পাথরের একটি বেদী—কবি ব্যবহার করেছেন এমন কিছু নয়, কিন্তু শুধু দাঁড়াবার বা বসবার একটু জায়গা। কবি নিজের হাতে যেটা আর দশটা গাছের বাগান করেছিলেন—সেই রকম ছোটো ছোটো গাছ হয়তো এক এক পাশে। বিস্তীর্ণ প্রান্তর—চারদিক থেকে প্রশস্ত রাস্তা এসে মিশেছে। এই হল কবির যথার্থ স্মরণ-চিহ্ন। ওর মাটির দেহের কোন চিহ্ন তাতে নেই—আছে শুধু ওঁর মনের একটা ইঙ্গিত। এইখানে লোকে এসে দাঁড়াবে। এইখানে খোলা আকাশের নীচে কবির কথা স্মরণ করবে। উৎসবের দিন হবে আশ্রমের সকলের মেলবার জায়গা। কবির কথা যখন ভাবি, এছাড়া আর কিছুতো তাঁর যোগ্য বলে মনে হয় না।

রবীন্দ্র জন্ম শতবার্ষিকী সংখ্যা

গল্প-ভারতী

বৈশাখ ১৩৬৮

সম্পাদক—ডক্টর কালিদাস নাগ।

বহু অভিনব ও আকর্ষণীয় বিষয়ে এই সংখ্যা সমৃদ্ধ।
এই সংখ্যার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য:

রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ চিত্তাকর্ষক রচনা, দেশ-বিদেশের প্রখ্যাত লেখক-লেখিকাদের স্মৃতিকথা ও আলোচনা, রবীন্দ্রনাথের অপ্রকাশিত পত্রাবলী, বহু চিত্তাকর্ষক, দুষ্প্রাপ্য ও অপ্রকাশিত আলোকচিত্রের একটি অপূর্ব অ্যালবাম।

এই বিরাট গ্রন্থে যাঁহারা লিখিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে আছেন:—সর্বশ্রী হেমেন্দ্র-প্রসাদ ঘোষ, শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু, অধ্যাপক শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র, অন্নদাশঙ্কর রায়, ক্ষিতীশ রায়, প্রভাত মুখোপাধ্যায়, সুজিত মুখোপাধ্যায়, কানাই সামন্ত, হেমেন্দ্রকুমার রায়, স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, প্রেমেন্দ্র মিত্র, গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সুধাকান্ত রায়চৌধুরী, চিন্তাহরণ সেন, নারায়ণ চৌধুরী, অজিতকৃষ্ণ ঘোষ, ডঃ রথীন রায়, সীতা দেবী, শান্তা দেবী, ডাঃ মৈত্রেয়ী দেবী, ডঃ কল্যাণ গঙ্গোপাধ্যায়, সুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, মোহিত ভট্টাচার্য প্রভৃতি।

এই গ্রন্থের অন্যতম বৈশিষ্ট্য একটি অভিনব ইংরাজী অধ্যায়। সোভিয়েট রাশিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, গ্রেট বৃটেন, ফ্রান্স, জার্মানী, জাপান, পোল্যান্ড, চেকোস্লোভাকিয়া প্রভৃতি দেশ হইতে সংগৃহীত ইংরাজী প্রবন্ধসম্ভার।

ভারত ও ভারতের বাহিরে রবীন্দ্রানুরাগী প্রতিটি পরিবারে সাদরে রক্ষিত হইবার মত এই অমূল্য গ্রন্থের মূল্য মাত্র ৩.০০ টাকা (ডাক মাশুল স্বতন্ত্র)।

কবিপক্ষে প্রকাশিত হইতেছে

অগ্রিম টাকা পাঠাইয়া অর্ডার দিন।
ভারতের সর্বত্র ও ভারতের বাহিরে এজেন্ট আবশ্যক।
এজেন্টগণ কত কপি প্রয়োজন জানাইয়া সত্বর পত্র দিখুন।
২৭১-বি, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা—৬।
ফোন:—৫৫-০২১৪

মানুষের সঙ্গে আমাদের যে পরিচয় তাকেও আমরা বারবার নানা রকম গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করতে চেষ্টা করি। কিন্তু তাতে শুধু নিজেকেই ছোটো করি। তাই যেখানে আমাদের সত্যি দরদ, সেইখানেই বারে বারে বন্ধন কাটাবার প্রয়োজন আছে। তাতে মন বাধিত হয় ফিরে ফিরে আঁকড়িয়ে ধরতে চায়। তবু মনে রাখতে হবে যে, সব চেয়ে বড়ো কথা মুক্তরূপে জানা। কিন্তু মুখে যতো সহজে বলি মন তো ততো সহজে বোঝে না। বারে বারে মনকে সান্ত্বনাতেও হয়। আজ সকাল বেলা বসে বসে চেষ্টা করছি সেই অনুভূতিটি খুঁজে পাওয়ার জন্য, যা সুখও নয়, দুঃখও নয়, শুধু শান্তি।

৮ই মার্চ, ১৯৪২ "উত্তরায়ণ"